سورة الانشقاق

সূরা ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৫ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ
كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ
كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ
بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا
اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ সিজদা
أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার

পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পেঁৗছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে, (১১) সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (১৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না। (২২) বরং কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (দ্বিতীয় ফুঁকের সময়) আকাশ বিদীর্ণ হবে (তাতে মেঘমালার ন্যায় ফেরেশতা-বাহী এক বস্তু অবতীর্ণ হয়। يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ আয়াতে এর উল্লেখ আছে)। এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ বিদীর্ণ হওয়ার সৃষ্টিগত আদেশ পালন করার অর্থ, তা ঘটা)। এবং আকাশ (আল্লাহ্র কুদরতের অধীন হওয়ার কারণে) এরই উপযুক্ত (যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তা অবশ্যই হবে) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (যেমন চামড়া অথবা রবারকে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে পৃথিবীর পরিধি বর্তমানের চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে, যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের তাতে স্থান সংকুলান হয়; দুররে মনসূরে বর্ণিত এক হাদীসে আছেঃ

تمد الارض يوم القيامة مد الاديم সুতরাং আকাশের বিদীর্ণ হওয়া এবং পৃথিবীর সম্প্রসারণ উভয়টি হাশরের হিসাব-নিকাশের অন্যতম ভূমিকা)। এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত বস্তুসমূহকে (অর্থাৎ মৃতদেরকে) বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং (সমস্ত মৃত থেকে) খালি হয়ে যাবে এবং সে (অর্থাৎ পৃথিবী) তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং সে এরই উপযুক্ত। (এর তফসীর পূর্বের ন্যায়। তখন মানুষ তার কৃতকর্ম-সমূহ দেখবে; যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ) হে মানুষ, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট পেঁৗছা পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত) চেষ্টা করে যাচ্ছ (অর্থাৎ কেউ সৎ কাজে এবং কেউ অসৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছে), অতঃপর (কিয়ামতে) সেই চেষ্টার (প্রতিফলের) সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। (তখন) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার কাছ থেকে

সহজ হিসাব নেওয়া হবে এবং সে (হিসাব শেষে) তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্ট-চিত্তে ফিরে যাবে। (সহজ হিসাবের স্তর বিভিন্ন রূপ—এক. হিসাবের ফলে মোটেই আযাব হবে না। তারা কোনরূপ আযাব ব্যতিরেকেই মুক্তি পাবে। এবং দুই. হিসাবের ফলে চিরস্থায়ী আযাব হবে না। এটা সাধারণ মু'মিনদের জন্য হবে। এক্ষেত্রে অস্থায়ী আযাব হতে পারে। পক্ষান্তরে) যার আমলনামা (তার বাম হাতে) পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে [অর্থাৎ কাফির। সে হয় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকবে, ফলে বাম হাত পশ্চাতে থাকবে; না হয় মুজাহিদের উক্তি অনুযায়ী তার বাম হাত পৃষ্ঠদেশে করে দেওয়া হবে।—(দুররে-মনসূর], সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (যেমন, বিপদে মৃত্যু কামনা করার অভ্যাস মানুষের আছে) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে (দুনিয়াতে) তার পরিবার-পরিজনের (ও চাকর-নকরের) মধ্যে আনন্দিত ছিল (এমনকি, আনন্দের আতিশয্যে পরকালকেও মিথ্যা মনে করত) সে মনে করত যে, সে কখনও (আল্লাহ্‌র কাছে) ফিরে যাবে না। (অতঃপর এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে) কেন ফিরে যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে সম্যক দেখতেন (এবং তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছিলেন। তাই এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল)। অতএব, আমি শপথ করছি, সন্ধ্যাকালীন লাল আভার এবং রাত্রির এবং রাত্রি যা নিজের মধ্যে ধারণ করে তার (অর্থাৎ সেসব প্রাণীর, যারা বিশ্রামের জন্য রাত্রিতে নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে আসে) এবং চন্দ্রের যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে (অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র হয়ে যায়, এসব জিনিসের শপথ করে বলছি) তোমাদেরকে অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। এটা يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ থেকে فَمُلَاقِيهِ পর্যন্ত বর্ণিত সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ। এসব অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুর অবস্থা, বরযখের অবস্থা, কিয়ামতের অবস্থা। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে একাধিক অবস্থা আছে। শপথের সাথে এগুলোর মিল এই যে, রাত্রির অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়। প্রথমে পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা যায়, এরপর রাত্রি গভীর হলে সব নিদ্রিত হয়ে যায়। চন্দ্রালোকের আধিক্য এবং স্বল্পতায়ও এক রাত্রি অন্য রাত্রি থেকে ভিন্ন রূপ হয়। এগুলো সব মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার অনুরূপ। এছাড়া মৃত্যু পরকালের সূচনা, যেন সন্ধ্যাকালীন লাল আভা রাত্রির সূচনা। অতঃপর বরযখের অবস্থান মানুষের নিদ্রিত থাকার অনুরূপ এবং ক্ষয়-প্রাপ্তির পর চন্দ্রের পূর্ণ রূপ লাভ করা সবকিছু ধ্বংসের পর কিয়ামতের পুনরুজ্জীবন লাভ করার সাথে সামঞ্জস্যশীল)। অতএব (ভীত হওয়ার ও ঈমান আনার এসব কারণ থাকা সত্ত্বেও) মানুষের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (তাদের হঠকারিতা এতদূর যে) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্‌র কাছে নত হয় না বরং (নত হওয়ার পরিবর্তে) কাফিররা (উল্টো) মিথ্যারোপ করে। তারা যা (অর্থাৎ কুকর্মের ভাণ্ডার) সংরক্ষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ জানেন। অতএব (এসব কুফরী কর্মের কারণে) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিয়ে দিন। কিন্তু যারা ঈমান

আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার, (সৎ কর্ম শর্ত নয়---কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফিল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা---পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে। অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কিয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اَذِنَتْ-এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। حُقَّتْ-এর অর্থ حُقَّ لَهَا الْاِنْقِيَادُ অর্থাৎ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ দুই প্রকার ঃ এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দু' অর্থ হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্‌র নির্দেশ দুই প্রকার---১. শরীয়ত-গত নির্দেশ ; এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতি-পক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে স্বেচ্ছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে ; যেমন মানব ও জিন। এই শ্রেণীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফির এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তকদীরগত নির্দেশ ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই যে, চুল পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে ; জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন, কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذرہ ذرہ دہر کا پابستۂ تقدیر ہے
زندگی کے خواب کی جامی یہی تقدیر ہے

এস্থলে এটা সম্ভবপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসামাত্রই তারা স্বেচ্ছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে

সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হয়, যাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোন দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর। তবে أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ—এর ভাষা প্রথমোক্ত অর্থের অধিক নিকটবর্তী। দ্বিতীয় অর্থ ও রূপক হিসাবে হতে পারে।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ—مد—এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে।—(মাযহারী)

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ—অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগীরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ—كدح—এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। إِلَىٰ رَبِّكَ—অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্র দিকে চূড়ান্ত হবে।

আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাফির-মু'মিন নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগতভাবে কোন না কোন বিষয়কে লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে অভ্যস্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এবং তাতে স্বীয় শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে, তেমনি দুষ্কর্মী ও অসৎ ব্যক্তিও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেখুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক শ্রম স্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনযিল, যা সে অজ্ঞাতসারেই

অব্যাহত রেখেছে। এই সফরের শেষ সীমা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিতি অর্থাৎ মৃত্যু। الى ربك বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে। এই শেষ সীমা এমন একটি অকাট্য সত্য, যা অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাবনিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎ ও অসতের পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে জানা যায়। নতুবা ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। একজন সৎ লোক একমাস মেহনত-মজুরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যোগাড় করে, চোর ও ডাকাত তা এক রাত্রিতে অর্জন করে ফেলে। যদি হিসাবে কোন সময় না আসে এবং প্রতিদান ও শাস্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সৎ লোক এক পর্যায়ে চলে যাবে, যা বিবেক ও ইনসাফের পরিপন্থী। অবশেষে বলা হয়েছে ঃ فَمُلَاقِيهِ—এর সর্বনাম দ্বারা كدح ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা رب -ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্য তার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর সৎ ও অসৎ এবং মু'মিন ও কাফির মানুষের আলাদা আলাদা পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। ডান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। ডান হাতওয়ালারা জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বাম হাতওয়ালারা জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ পেয়ে যাবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বস্তুও সৎ-অসৎ উভয় প্রকার লোকই অর্জন করে। এভাবে পার্থিব জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিণতি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিণতি অনন্ত আযাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিণতির কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিধারা আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে দেয় না। যাতে দুনিয়াতেও তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয়?

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا—এতে মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ من حوسب يوم القيامة عذاب—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্ন করলেনঃ কোরআনে কি يحاسب حسابا يسيرا বলা হয়নি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।—(বুখারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মু'মিনদের কাজকর্মও সব আল্লাহ্র সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. পরিবার-পরিজনের অর্থ জান্নাতের হুরগণ। তারাই সেখানে মু'মিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই. দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসা-বের পর যখন মু'মিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী সাফল্যের সুসং-বাদ শুনানোর জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তফসীরকারকগণ উভয় অর্থ বর্ণনা করেছেন। —(কুরতুবী)

انه كان فى اهله مسرورا—অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পার্থিব জীবনে কখনও নিশ্চিন্ত হয় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কোরআন পাক তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেঃ انا كنا فى اهلنا مشفقين—অর্থাৎ আমরা পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উভয় দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। যারা দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অতিবাহিত করত, আজ তাদের ভাগ্যে জাহান্নামের আযাব এসেছে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আযাবের ভয় রাখত, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও খুশী অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখে মত্ত ও বিভোর হয়ে যাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোন সময় কোন অবস্থাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় না।

فَلَآ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِ—এখানে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শপথের চারটি বস্তু এই বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে شفق-এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই লাল আভা, যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়। এটা রাত্রির সূচনা, যা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময় আলো বিদায় নেয় এবং অন্ধকারের সয়লাব চলে আসে। এরপর স্বয়ং রাত্রির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগুলোকে রাত্রির অন্ধকার নিজের মধ্যে একত্র করে। وسق -এর আসল অর্থ একত্র করা। এর ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে এতে জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অর্থও হতে পারে যে, যেসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলায় সেগুলো জড়ো হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্তু নিজ নিজ গৃহে ও বাসায় একত্রিত হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপত্র গুটিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন স্বয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে। চতুর্থ শপথ হচ্ছে : وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এটাও وسق থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্র করা। চন্দ্রের একত্র করার অর্থ তার আলোকে একত্র করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طبق বলা হয়। ركوب—এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে অগণিত পরিবর্তন, অব্যাহত সফর এবং তার চূড়ান্ত মনযিল : সে বীর্য থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর গোশ্‌তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর তাতে অস্থি সৃষ্টি হয়েছে, অস্থির উপর গোশ্‌ত হয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রূহ্ স্থাপন

করার ফলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গর্ভাশয়ের পচা রক্ত। নয় মাস পরে আল্লাহ্ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পচা রক্তের বদলে মায়ের দুধ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে গেল। দু'বছরের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা-সহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মায়ের দুধ ছাড়া পেয়ে আরও অধিক সুস্বাদু ও রকমারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক তার দিবারাত্রির একমাত্র কাজ হয়ে গেল। যখন কিছু জ্ঞান ও চৈতনা বাড়ল তখন শিক্ষাদীক্ষার যাঁতাকলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবন-সুলভ কামনা-বাসনা তার স্থান দখল করে বসল এবং এক রোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এল। বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মব্যস্ততায় দিবারাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটল। আঙ্গিক শক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনযিল কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্তু অদূরদর্শী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যু ও কবরই তার সর্বশেষ মনযিল। এরপর কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন যে, কবর তোমার সর্বশেষ মনযিল নয় বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজগৎ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনযিল নির্ধারিত হবে, যা হয় চিরস্থায়ী আরাম ও সুখের মনযিল হবে, না হয় অনন্ত আযাব ও বিপদের মনযিল হবে। এই সর্বশেষ মনযিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসস্থল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে إِلَىٰ رَبِّكَ — إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ এবং

كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ---বলে এই বিষয়বস্তুই বর্ণনা করেছে। সে গাফিল মানুষকে এই সর্বশেষ মনযিল সম্পর্কে অবহিত করে হুঁশিয়ার করেছে যে, বয়স হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার সফর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলাফেরায়, নিদ্রা ও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট---সর্বাবস্থায় এই সফরের মনযিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনযিলে অবস্থান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন আরাম, না হয় আযাবই আযাব এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। অতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরী ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য স্থির করা। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ---অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন কোন মুসাফির কয়েক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোন পথিক পথে

চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য থেমে যায়। উপরে বর্ণিত طبقا عن طبق -এর তফসীরের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত আবূ নাঈম (র) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ স্থলে কুরতুবী আবূ নাঈমের এবং ইবনে কাসীর (র) ইবনে আবী হাতেম (র)-এর বরাত দিয়ে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার সৃষ্টি ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উজ্জ্বল নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাফলতি ত্যাগ করে না। তাই শেষে বলা হয়েছে ঃ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ—অর্থাৎ এই গাফিল ও মূর্খ লোকদের কি হল যে, তারা সবকিছু শোনা ও জানার পরও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ—অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হিদায়তে পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্র দিকে নত হয় না।

سجود ও سجدة-এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সিজদা উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহ্র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোন বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সিজদার নির্দেশ নেই বরং নির্দেশটি সমগ্র কোরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আয়াতে পারিভাষিক সিজদা অর্থ নেওয়া হলে কোরআনের প্রত্যেক আয়াতে সিজদা করা অপরিহার্য হবে, যা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে কেউ এর প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন থাকে যে, এই আয়াত পাঠ করলে ও শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাহুল্য, কিঞ্চিৎ সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সিজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। কোন কোন হানাফী ফিকাহ্বিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এখানে القرآن বলে সমগ্র কোরআন বোঝানো হয়নি বরং الف لام عهد ى হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সদর্থই, যাকে সম্ভাবনার পর্যায়ে শুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এটা অবান্তর মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ফয়সালা হাদীস এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা হতে পারে। তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ফলে মুজতাহিদ আলিমগণও বিষয়টিতে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে এই আয়াতেও সিজদা ওয়াজিব। তিনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীসসমূহকে এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন ঃ

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত আবূ রাফে' (রা) বলেন ঃ আমি একদিন ইশার নামায হযরত আবূ হুরায়রার পিছনে পড়লাম। তিনি নামাযে সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ

করলেন এবং এই আয়াতে সিজদা করলেন। নামাযান্তে আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ এ কেমন সিজদা? তিনি বললেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পশ্চাতে এই আয়াতে সিজদা করেছি। তাই হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা করে যাব। সহীহ্ মুসলিম আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সূরা ইন্‌শিকাক ও সূরা ইকরায় সিজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র) বলেনঃ এটাই ঠিক যে, এই আয়াতটিও সিজদার আয়াত। যে এই আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা শুনে তার উপর সিজদা ওয়াজিব।---(কুরতুবী) কিন্তু ইবনে আরাবী (র) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সিজদা করার প্রচলন ছিল না। তারা হয়তো এমন ইমামের মুকাল্লিদ (অনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সিজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র) বলেনঃ আমি যখন কোথাও ইমাম হয়ে নামায পড়াতাম তখন সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ করতাম না। কারণ, আমার মতে এই সূরায় সিজদা ওয়াজিব। কাজেই যদি সিজদা না করি, তবে গোনাহ্‌গার হব। আর যদি করি, তবে গোটা জামাআত আমার এই কাজকে অপছন্দ করবে। কাজেই অহেতুক মতানৈক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।